দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 3-MAY 199[illegible]
পৃষ্ঠা: [illegible] কলাম [illegible]

চ্যান্সেলরের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর বদলে প্রেসিডেন্টের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বর্তমানে যে চরম অস্থিরতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যে চরম অরাজকতা চলছে তা বন্ধ করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওপর থেকে রাজনৈতিক খবরদারি বন্ধ করতে হবে। এজন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়এর চ্যান্সেলরের দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট-এর হাতে অর্পিত হওয়া এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খবরদারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মুক্ত করা সমীচীন হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। শিক্ষার পরিবেশ আনতে হলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই প্রধানমন্ত্রীর হাতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব থাকা যথাযথ হবে না বলেও বিভিন্ন মহল অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের যে জোরদার প্রচারণা শুরু করা হয়েছে, তা সফল করতে হলে সে সমস্যার মূলে হাত দিতে হবে। সে কথা ভাববার বিষয়টি আজ জরুরী হয়ে পড়েছে। একথা আজ আর কোনভাবে অস্পষ্ট নেই বা কারো কাছেই অজানা নেই যে, শিক্ষাঙ্গনের ছাত্র রাজনীতি পরিচালিত হয়ে থাকে রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনে। আগের ছাত্র রাজনীতর ওপর রাজনৈতিক দলগুলের পরোক্ষ প্রভাব ছিল, এখন চলছে সক্রিয় ভূমিকা এবং সরাসরি হস্তক্ষেপ। এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দলগুলোর ন্যক্কারজনক ভূমিকা শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। সরকারের সক্রিয়

(৫-এর পাতায় দেখুন)

চ্যান্সেলরের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর বদলে প্রেসিডেন্টের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভূমিকার কারণে এবং সরকারের সক্রিয় ইন্ধনের কারণে এখন নোংরা রাজনীতি শেকড় গেড়ে বসেছে শিক্ষকদের মধ্যে, প্রশাসনের মধ্যে এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনসমূহ আজ যে জর্জরিত, পর্যুদস্ত এবং বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, তা কেবল ছাত্র রাজনীতির কারণে নয়, শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হবার পেছনে রয়েছে শিক্ষকদের রাজনীতিও। বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যকার রাজনৈতিক সমীকরণ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। কোন গ্রুপ আওয়ামীপন্থী, কোন গ্রুপ বিএনপিপন্থী আবার কোন গ্রুপ জামাতপন্থী। শিক্ষকগণের সাথে সাথে অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও এখন পরিচিত হয়ে উঠেছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরসমূহের সর্বক্ষেত্রেই এখন বিভাজন। শিক্ষকে শিক্ষকে বিরাজমান অসহনীয় মতপার্থক্য ও রেষারেষী এবং ছাত্রে ছাত্রে রক্তক্ষয়ী হানাহানি। একই বিভাগের এবং একই বর্ষের ছাত্র হয়েও বিভিন্ন পরিচিতির কারণে তারা সংকোচহীনভাবে এবং নির্ভয়ে পাশাপাশি বসতে পারেন না। ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে, ক্যান্টিন এবং যে কোন স্থানে আড্ডা দিতে গেলেও গ্রুপের বাইরে যাওয়াটা বিপজ্জনক হিসেবে গণ্য হয়। একই বিভাগের একজন শিক্ষকও অপর আর একজন শিক্ষককে মারমুখী দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। খুন-জখম, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মঘট, অপসারণ, বহিষ্কার, পদত্যাগ, কোথাও না কোথাও কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও অচলাবস্থা লেগেই আছে। আগের চাইতে পরিস্থিতির এখন চরম অবনতি ঘটেছে। ভবিষ্যতে তা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বমহলে পরিচিত হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের জোরালো নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা হয়েছে। ইদানীং এ নিয়ন্ত্রণকে আরো জোরদার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর বর্তমানে একদিকে খবরদারি করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়। প্রধানমন্ত্রী আবার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরও। মূলত এ কারণেও পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে ভাইস চ্যান্সেলরকে শাসানোর ঘটনাও সম্প্রতি সংঘটিত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনাই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালকে অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। প্রধানমন্ত্রী যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর নন, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়েও সরকারের রাজনৈতিক খবরদারি প্রবল প্রতাপের সাথেই চলছে।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মহলে ইতোমধ্যেই দাবী উঠেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়েসমূহের ওপর থেকে রাজনৈতিক খবরদারি প্রশাসনিক, একাডেমিক এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই চ্যান্সেলরের দায়িত্ব থাকা চলবে না। প্রেসিডেন্ট-এর হাতে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব অর্পণ করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায় যে; ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রপ্রধান পদের নির্বাচনে যে নজির স্থাপন করেছে, তা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। দেশের প্রেসিডেন্ট যিনি নির্বাচিত হবেন, তিনি অবশ্যই হবেন একজন দেশপ্রেমিক, নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন বিজ্ঞোচিত, দক্ষ এবং বিবেকবান ব্যক্তিত্ব। দলীয় রাজনৈতিক ডামাডোলে যিনি মোটেই প্রভাবিত হন না। এমন এক মহতী ব্যক্তির হাতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব অর্পিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খবরদারি থেকেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মুক্ত করে দেয়া উচিত। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রেসিডেন্টের অধীনে বিশেষ ডিভিশন স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া যায়। এ ব্যাপারে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হবে এবং শিক্ষার পরিবেশও পুনরায় ফিরে আসবে।